দুর্বোধ্য সৃজনশীলে দিশাহারা শিক্ষা

(https://goo.gl/CV4ph2)

শরীফুল আলম সুমন ৯ মে, ২০১৮ ০০:০০

Share 0
মন্তব্য() () শেয়ার ()
প্রিন্ট (./home/printnews/634074/2018-05-09)

অ- অ অ+

শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু কতটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, তা যাচাই করতে ২০০৮ সালে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় সনাতনি পদ্ধতি বাদ দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করে সরকার। এই পদ্ধতিতে বলা হয়, পরীক্ষায় কী ধরনের প্রশ্ন থাকবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কোনো ধারণা থাকবে না। প্রশ্ন থাকবে নির্দিষ্ট সিলেবাস থেকে এবং তারা নিজেদের মতো করে উত্তর লিখবে। বর্তমানে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এই পদ্ধতি চালু রয়েছে।

কিন্তু এই সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীরা বাজারের নোট-গাইড-কোচিংনির্ভর হয়ে পড়ছে। শিক্ষকরাও নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে ক্লাসে পাঠদান এবং প্রশ্ন প্রণয়নে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন গাইড বইয়ের ওপর। ফলে মূল পাঠ্যপুস্তক থেকে সবাই দূরে সরে যাচ্ছেন। অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে জ্ঞানার্জন। গণমাধ্যমে বহুবার প্রচার করা হয়, এসএসসির প্রশ্ন হুবহু গাইড বই থেকে করা হয়েছে। একদিকে প্রশ্নপত্র

ফাঁসের ঘটনা, অন্যদিকে গাইড বই থেকে প্রশ্নের প্রচলন হওয়ায় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা হুমকিতে পড়েছে। গাইড বইনির্ভর ক্ষতিকর এই শিক্ষা পদ্ধতির ফলে ডিগ্রিধারী সার্টিফিকেটসর্বস্ব একটি মেধাহীন প্রজন্ম গড়ে উঠছে।

সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালুর সময় বলা হয়েছিল, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও যোগ্য একদল শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা এর সুফল পাবে; কিন্তু সেটা হয়নি। রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশনের (রেইস) জরিপ থেকে জানা যায়, মোট শিক্ষার্থীর এক-চতুর্থাংশই পরীক্ষার প্রশ্ন বুঝতে অক্ষম। তাদের কাছে কঠিন মনে হয় বিশেষ করে গণিত ও ইংরেজির মতো বিষয়গুলো। এতে আরো বলা হয়, শিক্ষার্থীদের ৯২ শতাংশই গাইড বইনির্ভর। তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝার জন্য গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়। অন্যদিকে শিক্ষকদের মাত্র ৪৫ শতাংশ এ পদ্ধতি বোঝে, ৪২ শতাংশ অল্প অল্প বোঝে, ১৩ শতাংশ এ পদ্ধতি বুঝতেই পারেনি।

গত বছরের এইচএসসির জীববিজ্ঞান পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন ছিল এমন–‘রফিক গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। অসাবধানতাবশত তার হাত কেটে রক্তপাত শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর রক্ত পড়া বন্ধ হয়।’ এটি হলো সৃজনশীল পদ্ধতিতে উদ্দীপকের অনুধাবনমূলক একটি প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর জানতে বলা হয়–‘উদ্দীপকের রক্তপাত বন্ধের কৌশলটি বর্ণনা করো।’ মূলত এই প্রশ্নের উত্তরে রক্ত জমাট বাঁধার যে চারটি বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। একজন জীববিজ্ঞানের শিক্ষক গত বছর পরীক্ষার ২০৫টি খাতা দেখেছেন। এর মধ্যে মাত্র সাতজন পরীক্ষার্থী এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে

পেরেছে। অন্য পরীক্ষার্থীদের বেশির ভাগ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখেছে। অনেকে লিখেছে, ‘রফিক হাত চেপে ধরেছিল বলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে।’

সম্প্রতি একটি দৈনিকে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নাছিম আখতার এই উদ্দীপকটির নমুনা তুলে ধরে বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের নতুন জ্ঞান সৃষ্টির জন্য রক্ত জমাটবাঁধার চারটি বৈজ্ঞানিক কারণ জানা অত্যাবশ্যক। এখন সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন না করে যদি সরাসরি রক্ত জমাটবাঁধার কারণ বর্ণনা করতে বলা হতো তাহলে ৫০ শতাংশ পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিতে পারত। অন্যদের কেউ তিনটি, কেউ দুটি বা একটি কারণ লিখতে পারত। অপ্রাসঙ্গিক উত্তর কেউ দিত না। বর্তমানে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠ্য বইয়ের অপরিহার্য বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, দক্ষ শিক্ষক, পর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধা না থাকলেও শিক্ষাকে বারবার পরীক্ষাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে উল্টো পথে হাঁটছে বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষার্থীরাও বড় ঘাটতি নিয়ে তাদের পড়ালেখা শেষ করছে। শিক্ষার্থীরা মূল জিনিস থেকে সরে গিয়ে ছুটছে সৃজনশীলের পেছনে। কারণ বই থেকে পরীক্ষায় কী কী আসবে তারা বুঝতে পারছে না। তাই তারা পড়াশোনাও করে না। ফলে হতাশা থেকে বিরাট মানসিক ও শারীরিক চাপের মধ্যে পড়ছে এই প্রজন্ম। আর চিকিৎসকরা বলছেন, এসব চাপ থেকে বাঁচতে তারা ব্যবহার করছে ধহীরড়ষুঃরপ ফত্ঁম। অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পর্যন্ত এটি নিচ্ছে। বুক ধড়ফড়ের জন্য তারা নিয়মিত খাচ্ছে এনডিভার জাতীয় ওষুধ। এভাবে শিক্ষার্থীদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে ভীতি কাজ করছে তা উঠে এসেছে মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী নিবিড়ের কথা থেকে। কালের কণ্ঠকে সে বলে, ‘অনেক প্রশ্ন খুব কঠিন মনে হয়। স্কুল শেষে প্রাইভেটে যেতে হয়। রাতে বাসায় পড়তে হয়। সারা দিন পড়ালেখার মধ্যে থাকতে হয়। যদি আমাদের সরাসরি প্রশ্ন থাকত, তাহলে উত্তর করতে এত সমস্যা হতো না।’

নিবিড়ের মা আইরিন আক্তার বলেন, “আমরা সৃজনশীল বুঝি না। এখন স্কুলে কী পড়ায় আর আমার ছেলে কী পড়ে, সেটাও বুঝতে পারি না। ছেলে বলে, ‘মা, ঠিকমতো বুঝি না।’ একটার পর একটা প্রাইভেটে দিচ্ছি। পড়ার জন্য চাপ দিচ্ছি। আমার ছেলে আর আরেক মেয়ের পড়ালেখা

উল্টো স্রোতে ১

শিক্ষা

- ৪১ শতাংশ শিক্ষক প্রশ্ন করতে পারেন না
- কেনা প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়

অর্ধেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

- প্রশিক্ষণে শুভংকরের ফাঁকি
- ঘাটতি নিয়েই পড়ালেখা শেষ করছে শিক্ষার্থীরা

নিয়ে পুরো পরিবারই মানসিক অশান্তির মধ্যে আছি।”

রাজধানীর একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং এসএসসি পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘সৃজনশীল পদ্ধতি অধিকাংশ শিক্ষকই বোঝেন না। ফলে তাঁরা নোট-গাইড থেকে প্রশ্ন করেন। শুধু নাম-স্থান ঘুরিয়ে দিলেই হয়ে যায় নতুন প্রশ্ন। শিক্ষার্থীরাও নোট-গাইড পড়ে। পাবলিক পরীক্ষায় কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। লিখলেই পাস, এটাই নিয়ম। কিন্তু যে শিক্ষার্থী সৃজনশীল পদ্ধতির কিছুই বোঝে

না, সে আবোলতাবোল লিখে খাতা ভরে রাখে। তাকেও আমাদের পাস করাতে হয়। আর স্কুলের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের মান-সম্মান বিবেচনা করে আমরা তেমন একটা ফেল করাই না। এভাবেই চলছে সৃজনশীল পদ্ধতি।’

সৃজনশীল পদ্ধতির ১০ বছর পার হলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থী কেউই এখনো ঠিকমতো সৃজনশীল বোঝে না। গত জানুয়ারি মাসে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মনিটরিং শাখার ‘একাডেমি তদারকি প্রতিবেদন’ জানিয়েছে, মাধ্যমিক স্কুলের ৫৪ শতাংশ শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেননি। তাঁদের ২২ শতাংশের অবস্থা খুবই নাজুক। বাকিরা এ সম্পর্কে যে ধারণা রাখেন, তা দিয়ে আংশিক প্রশ্নপত্র তৈরি করা সম্ভব নয়। আর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও প্রায় একই চিত্র পাওয়া গেছে।

সরকারি হিসাবেই এখনো ৪১ শতাংশ শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝেন না। প্রশ্নও করতে পারেন না। তাহলে এই শিক্ষকরা যে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন তারা কিভাবে সৃজনশীল পদ্ধতি বুঝবে—এটাই সংশ্লিষ্টদের প্রশ্ন। আর এই সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশিক্ষণের নামেও চলছে শুভংকরের ফাঁকি। এখন পর্যন্ত অর্ধেকেরও কম শিক্ষককে সৃজনশীল পদ্ধতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নামকাওয়াস্তে এই প্রশিক্ষণ হলো মাত্র তিন দিনের। এই স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণে একটি বিষয়ের সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের বোঝা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ফলে তাঁদের বেশির ভাগ সৃজনশীল পদ্ধতি আত্মস্থ করতে পারছেন না। এ কারণে ১০ বছর পার হওয়ার পরও জোড়াতালি দিয়েই চলছে সৃজনশীল পদ্ধতি।

গত নভেম্বরে প্রকাশিত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের একাডেমি তদারকি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখনো ৪০.৮১ শতাংশ শিক্ষক নিজেরা সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারেন না। গত বছর সাত হাজার ৩৫৮টি বিদ্যালয় সুপারভিশন করে এ তথ্য পায় তারা।

একাডেমি তদারকি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ৫৯.১৯ শতাংশ শিক্ষক নিজেরা সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারেন। অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহায়তায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন ২৫.৯৯ শতাংশ শিক্ষক। আর বাইরে থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন করেন ১৪.৮৩ শতাংশ শিক্ষক। সর্বাধিক খুলনা অঞ্চলের ৭৮.০৬ শতাংশ শিক্ষক নিজেদের প্রশ্ন নিজেরা করতে পারেন। আর সর্বাধিক পিছিয়ে রয়েছে বরিশাল অঞ্চল। এই অঞ্চলের মাত্র ২৬.৫৯ শতাংশ শিক্ষক নিজেরা সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্ন করতে পারেন। অর্থাৎ ৭৩.৩৯ শতাংশ শিক্ষকই সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝেন না। ঢাকা অঞ্চলের ৪৪.১৪ শতাংশ, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৩২.৩১ শতাংশ, সিলেট অঞ্চলের ৪২.৩৬ শতাংশ, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৩৭.৩৮ শতাংশ, রংপুর অঞ্চলের ৪২.৯৬ শতাংশ, রাজশাহী অঞ্চলের ৪১.১৩ শতাংশ এবং কুমিল্লা অঞ্চলের ৪৫.৪৪ শতাংশ শিক্ষক নিজেরা সৃজনশীল প্রশ্ন করতে পারেন না।

তদারকি করা সাত হাজার ৩৫৮টি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ৯৪ হাজার ৭৩৩ জন। এর মধ্যে সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৫৪ হাজার ১৯৬ জন। সর্বাধিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১৩ হাজার ৪৬২ জন শিক্ষক। আর সবচেয়ে কম প্রশিক্ষণ পেয়েছেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক হাজার ৭৮১ জন শিক্ষক।

মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক মো. মাহবুবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে আগে শিক্ষকদের তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিন দিনের এই প্রশিক্ষণ খুব একটা কার্যকর হয়নি। ফলে সম্প্রতি নতুন করে আরো এক হাজার মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা এখন সৃজনশীল পদ্ধতি বিষয়ে তিন দিনের পরিবর্তে ছয় দিনের প্রশিক্ষণ দেবেন। আশা করছি এতে শিক্ষকরা এবার ভালোভাবে সৃজনশীল পদ্ধতি বুঝতে পারবেন। এ ছাড়া আরো কিভাবে সৃজনশীল বিষয়ে শিক্ষকদের দক্ষ করে তোলা যায় তা নিয়েও নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে।’

সূত্র জানায়, সৃজনশীলতা বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রগ্রাম (সেসিপ) নামের একটি প্রকল্পের আওতায়। এ ছাড়া মাউশি অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ শাখা থেকেও সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লাখ। তাঁদের মধ্যে কতজন সৃজনশীল প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এর সঠিক হিসাব কারো কাছে নেই। তবে সেসিপ প্রগ্রাম থেকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ খাতে পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়ন বিষয়ে দুই লাখ ২৪ হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ চলমান। এ ছাড়া ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৬০ হাজার ৭৭০ জন শিক্ষককে সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, এই প্রশিক্ষণেও রয়েছে অনেক ফাঁকি। কারণ সৃজনশীল প্রশিক্ষণের জন্য প্রথমে তৈরি করা হয় মাস্টার ট্রেইনার। এই মাস্টার ট্রেইনাররাই মূলত শিক্ষকদের তিন দিনের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মাস্টার ট্রেইনাররাই ঠিকমতো সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝেন না। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কিভাবে তাঁরা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন? এ ছাড়া প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পার্টটাইম বা খণ্ডকালীন শিক্ষক রয়েছেন, যাঁদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়নি। দেখা যাচ্ছে তাঁরাও ক্লাসে নিয়মিত সৃজনশীল পড়াচ্ছেন।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) আয়োজন করে 'বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন : শিক্ষায় করণীয়, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক দুই দিনের জাতীয় সেমিনার। সেখানে মূল প্রবন্ধে আইইআরের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তারিক আহসান বলেন, 'সৃজনশীলতাকে আমরা যেভাবে বলছি, আসলে কি তাই? একজন মানুষ কি সব বিষয়ে একসঙ্গে সৃজনশীল হতে পারে? সৃজনশীলের ৯টা ডাইমেনশনের মধ্যে লেখনী একটা। আমাদের দেশে কেন শুধু লেখনী দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর পুরো সৃজনশীলতা বিবেচনা করা হবে? তাহলে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল কি সৃজনশীল ছিলেন না?'

২০০৮ সালে শুরু হয় সৃজনশীল পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পাঠ্য বইয়ে যে মূল পাঠ রয়েছে এর থেকে প্রশ্ন না করে এরই মূলভাবের আলোকে বাইরের দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। সেই দৃষ্টান্ত থেকে জ্ঞানমূলক, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা–এই চারটি স্তরে বিন্যাস করে প্রশ্ন করা হয়। শিক্ষার্থীরা মূল পাঠের দৃষ্টান্ত অনুসরণে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। আগে মূল পাঠ থেকে পাঠ্য বইয়ে প্রশ্নপত্র থাকত। শিক্ষকরা পরীক্ষার সময় তা দেখে প্রশ্ন তৈরি করতেন। কিন্তু বর্তমানে নমুনা প্রশ্ন থাকে মাত্র একটি। পাঠ বিশ্লেষণ করে বাইরের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রশ্ন করার কারণে সময় নিয়ে উদ্দীপক (একধরনের দৃষ্টান্ত) তৈরি করতে হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি কোনোভাবেই আত্মস্থ করতে পারছেন না শিক্ষকরা। ফলে শিক্ষার্থীদেরও ভালোভাবে বোঝাতে পারছেন না তাঁরা।

রাজধানীর কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ মো. রহমত উল্লাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা কম এবং নিয়োগে অনিয়ম থাকায় এত দিন মেধাবীরা এ পেশায় আসেননি। এ কারণে এখনো অনেক অদক্ষ শিক্ষক রয়ে গেছেন। সরকারের প্রশিক্ষণ সবার জন্য একই ধরনের। একজন মেধাবী শিক্ষককে যে লেভেলে প্রশিক্ষণ দিলে তিনি তা আত্মস্থ করতে পারেন, একজন কম মেধাবী শিক্ষককে সেই লেভেলে প্রশিক্ষণ দিলে তিনি তো বুঝতে পারবেন না। তাই দক্ষ ও অদক্ষদের আলাদাভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেউ যদি না বোঝেন তাঁকে পুনরায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সৃজনশীল এই প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতাও থাকতে হবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সর্বশেষ ২০১৪ সালের মে মাসে এক অফিস আদেশে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রশ্ন সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ করা হয়। ওই আদেশে যেসব স্কুল, কলেজ, মাদরাসা এখনো নিজেরা সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারে না তাদের চিহ্নিত করে এমপিও বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের কথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে জানিয়ে দিতে মাউশিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরও পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটেনি। এমনকি একাধিক পাবলিক পরীক্ষায় গাইড থেকে হুবহু প্রশ্ন তুলে দেওয়ার প্রমাণ মিলেছে। আর স্কুল-কলেজে হরহামেশাই কেনা প্রশ্নে নেওয়া হচ্ছে পরীক্ষা।

Like Share 0 টুইট Share

মন্তব্য

Comment:

Enter your name...

Enter a valid email address

I'm not a robot
reCAPTCHA
Privacy - Terms

Submit

আলোচিত সংবাদ

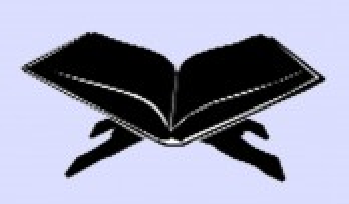

এসএসসির রেজাল্ট প্রকাশ (https://kalerkantho.com/photo-gallery/photonews/284)

গরমে হাঁস-ফাঁস (https://kalerkantho.com/photo-gallery/photonews/283)

বার্লিনে 'বেস্ট' বাংলাদেশের অপ্সরা (https://kalerkantho.com/photo-gallery/entertainmentpics/282)

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন, নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্রধান কার্যালয় : প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ ও সুপ্রভাত মিডিয়া লিমিটেড ৪ সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে মুদ্রিত। পিএবিএক্স : ০৯৬১২১২০০০০, ৮৪৩২৩৭২-৭৫, বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৮৪৩২৩৬৮-৬৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮৪৩২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮৪৩২০৪৭, সার্কুলেশন : ৮৪৩২৩৭৬। E-mail : info@kalerkantho.com

Copyright © 2015-2018 kalerkantho.com